ATHENA, VOLUME X, JULY 2026 C.E. (ISSN: 2454-1605), pp. 169-179
*www.athenajournalcbm.in*

# নজরুলের নন্দনভাবনা

**ড. দীপেশ প্রামাণিক***

প্রাপ্ত: ২৮.০২.২০২৬ পরিমার্জন: ২১.০৪.২০২৬ গৃহীত: ২৫.০৫.২০২৬

***সারসংক্ষেপ:*** *নজরুল ইসলামের নানা প্রবন্ধে, অভিভাষণে ও নানাজনকে লেখা চিঠিপত্রে তাঁর নন্দনভাবনার সূত্রগুলি বীজাকারে ছড়িয়ে রয়েছে৷ তিনি সাহিত্যের সর্বজনীন হয়ে ওঠার কথা বলেছেন, যদিও কবির দেশকালের বিশেষত্বকে উপেক্ষা করেননি৷ নজরুলের নন্দনভাবনা সত্য-সুন্দর-মঙ্গলকে ভিত্তি করে রচিত হলেও তার কেন্দ্রে রয়েছে সুন্দর। কবিতা সৃজনের ক্ষেত্রে তিনি দৈবপ্রেরণায় বিশ্বাসী। দৈবপ্রেরণা, সুন্দরের অনুধ্যান, আবেগের প্রাধান্য, প্রেম ও বেদনা নজরুলের নন্দনভাবনাকে অনেক ক্ষেত্রে রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের কাছাকাছি এনে দাঁড় করালেও তাঁকে পুরোপুরি এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। আবেগের প্রাবল্য, তারুণ্যের উচ্ছ্বাস ও উদ্দামতা, শাসকের নিপীড়ন ও সামাজিক অচলায়তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে বাংলা কবিতায় তিনি বিশিষ্ট হয়ে আছেন। তাঁর সাম্যবাদী ভাবনায় মার্কসের অনুপুঙ্খ অনুসরণ নেই। নজরুলের নন্দনভাবনা পরবর্তীকালের বাংলা কবিতাকে এগিয়ে চলার পথ দেখিয়েছে। কবির নন্দনভাবনার মূলসূত্রগুলিকে সংহতরূপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে।*

***সূচক শব্দ:*** *সুন্দর, সর্বজনীনতা, দৈবপ্রেরণা, বিদ্রোহ, সাম্যবাদ, উপনিবেশবাদ-বিরোধিতা, আধুনিকতা।*

---

*স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, ড. বি.আর. আম্বেদকর কলেজ, বেতাই, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail: dipeshacademic@gmail.com

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.) নন্দনতাত্ত্বিক ছিলেন না, ছিলেন কবি এবং বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী। একজন কবিরূপে তিনি কবিতা-সম্পর্কিত যে সমস্ত জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়েছিলেন—সেই সমস্ত পরিপ্রশ্ন, অনুসন্ধান ও অভিমতকে খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর নানা প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও নানাজনকে লেখা চিঠিপত্রে। সেখানে তাঁর নন্দনভাবনার সূত্রগুলি বীজাকারে ছড়িয়ে রয়েছে। কবিতা-সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা ও উত্তরসন্ধানের ক্ষেত্রে কবি যেহেতু তাত্ত্বিক পটভূমি পরিহার করে নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভবকে তুলে ধরেছেন, তাই এক্ষেত্রে 'নন্দনতত্ত্ব'-এর পরিবর্তে 'নন্দনভাবনা' শব্দবন্ধটি ব্যবহৃত হলো। কবির নন্দনভাবনার মূলসূত্রগুলিকে সংহতরূপে তুলে ধরাই বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের উদ্দেশ্য। নজরুলের ছন্দ-অলংকার-চিত্রকল্প সম্পর্কিত ভাবনাকে সচেতনভাবে এই স্বল্পায়তন নিবন্ধের পরিসরের বাইরে রাখা হয়েছে।

১৯১৯ থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নজরুলের লেখনি সচল ছিল। এই সময়পর্বে বৃহত্তর দেশ-কাল-সমাজ কেমনভাবে তাঁর কবিমানসে ছায়াপাত করেছে, তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তাঁর কবিতা ও নন্দনভাবনার পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাসও নিবিড় পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে। মনে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক, আধুনিক বাংলা কবিতার প্রস্তুতিপর্বে নন্দনভাবনার নিরিখে রবীন্দ্রনাথ থেকে অনুজ কবির স্বাতন্ত্র্য কোথায়? নজরুলের নন্দনভাবনাকে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারলে তাঁর কবিতাপাঠ সার্থকতর হয়ে উঠবে। স্পষ্টতর হবে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বিদ্রোহী' কবিরূপে তাঁর স্থানাঙ্কের তাৎপর্য। বাংলা কবিতার ইতিহাসে তিনি যেভাবে চর্চিত হয়ে আসছেন, তারও পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন।

'তরুণের সাধনা' শীর্ষক নিবন্ধে নজরুল বলছেন— "আমি কবি। বনের পাখির মতো স্বভাব আমার গান করায়। কাহারও ভালো লাগিলেও গাই, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই।"[১] মনোধর্মে এই উচ্চারণ একজন গীতিকবির, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ যাঁর প্রধান শক্তি। ১১-৮-২৬ তারিখে শামসুন নাহার মাহমুদকে চিঠিতে নজরুল জানাচ্ছেন— "বড়ো বড়ো কবির কাব্য পড়া এই জন্য দরকার যে তাতে কল্পনার জট খুলে যায়, চিন্তার বদ্ধ ধারা মুক্তি পায়।"[২] ৩০ অক্টোবর, ১৯৪০ কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ 'স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ'-এ কবি বলছেন—

> আনন্দ ও সৌন্দর্যের তৃষ্ণা মানুষের চিরন্তন।...মানুষের এই সৌন্দর্য-ক্ষুধা থেকেই কাব্যের সৃষ্টি, কবির জন্ম মানুষের আনন্দ ও সৌন্দর্য পরিবেশন করার জন্যই কবিরা এসে থাকেন।[৩]

স্পষ্ট হচ্ছে যে, নজরুলের নন্দনভাবনায় আনন্দের পাশাপাশি সৌন্দর্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা। 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুলের অভিমত—

> সাহিত্য কাব্য প্রভৃতি সকল সুকুমার শিল্পই বিলাসী মনের খাদ্য, কর্মক্লান্ত মনকে আনন্দ দিয়ে তাজা রাখে এই আনন্দ-রস।...কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই রস-বিলাসেই মত্ত থাকেননি, শক্তিহীন জাতিকে শক্তি দিয়েছিলেন, গুরুর মতো তাদের ত্যাগের পথে বৈরাগ্যের পথে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়ার প্রবল প্রচেষ্টা নিয়ে এসেছিলেন।[৪]

বঙ্কিমচন্দ্রকে এমন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের কাব্যকবিতা সম্পর্কেও নজরুলের মনোভঙ্গি স্পষ্টতর হয়। পাঠককে শুধুমাত্র নান্দনিক আনন্দদানের উদ্দেশ্যেই নজরুল কলম ধরেননি, তা তাঁর নন্দনভাবনার আরও গভীরে প্রবেশ করলে অনুধাবন করা যাবে। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে ইব্রাহিম খানকে লেখা চিঠিতে নজরুলের সাবধান-বাণী— "আমার বিশ্বাস কাব্যকে ছাপিয়ে উদ্দেশ্য বড়ো হয়ে উঠলে কাব্যে হানি হয়।"[৫]

নিবিড় অভিজ্ঞতা ব্যতীত কবিতার রূপায়ণ সম্ভব নয়, তা কবিতারচনার প্রাথমিক ভিত্তি। ২২ মার্চ ১৯৪০ কলকাতার ২/১ ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ সম্মেলনের অভিভাষণে নজরুল জানান— "আমার কাব্য, আমার গান আমার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য হতে জন্ম নিয়েছে। আমি জীবনের ছন্দে গেয়ে চলেছি—এসব তারই প্রকাশ।"[৬] যদিও অভিজ্ঞতাকে বিশেষের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলে না, হয়ে উঠতে হয় সর্বজনীন। ১৯২৯-এর ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার অ্যালবার্ট হলে সংবর্ধনাসভায় প্রদত্ত 'প্রত্যভিভাষণ'-এ নজরুল বলেন—

> আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।[৭]

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ আনওয়ার হোসেনকে লেখা চিঠিতে নজরুল বলেন— "ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না জন্মও লাভ করতে পারে না।"[৮] যে ধর্মীয় গোঁড়ামি শিল্পের উপর খড়্গহস্ত, নজরুল তার বিরুদ্ধেই এক হাত নিয়েছেন। কবিতায় কবি বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রকে অতিক্রম করে যান। এভাবে কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সর্বজনীন হয়ে ওঠে। সেকারণে, নজরুল মনে করছেন, কবির প্রাণ হবে আকাশের মতো উন্মুক্ত উদার, তাতে কোনো ধর্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, বড়ো-ছোটো জ্ঞান থাকবে না। 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুল সাহিত্যে সর্বজনীনতার প্রসঙ্গটি বিশদে বলছেন—

> সাহিত্যিক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, বিশ্বের ব্যথায় ছোঁয়া দিবেন। সাহিত্যিক যতই কেন সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুন না, তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যে-কোনো লোক বলিতে পারে, ইহা তাঁহারই অন্তরের অন্তরতম কথা; ইহা তাঁহারই বুকে গুমরিয়া মরিতেছিল, প্রকাশের পথ পাইতেছিল না। এইরূপেই বিশ্বসাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকে বলে সাহিত্যে সর্বজনীনতা। ...আমাদিগকেও তাই এখন করিতে হইবে সাহিত্যে সর্বজনীনতা সৃষ্টি। অবশ্য, নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়াইয়া, না হারাইয়া।[৯]

উপরের উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটি নজরুলের নন্দনভাবনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কবি কাব্যকবিতাকে কোনো সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখতে চাননি। কিন্তু তাই বলে সর্বজনীনতার দোহাই দিয়ে তিনি তাঁর দেশ-কাল-সমাজের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো থেকে মুখ ফিরিয়েও থাকেননি। ইব্রাহিম খানকে লেখা একটি চিঠিতে সমাজ সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি— "সত্য সত্যই আমার লেখা দিয়ে যদি আমার মুমূর্ষু সমাজের চেতনা সঞ্চার হয়, তা হলে তার মঙ্গলের জন্য আমি আমার কাব্যের আদর্শকেও না হয় খাটো করতে রাজি আছি।"[১০] 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতার প্রথম স্তবকেই নজরুলের অভিমানী উচ্চারণ—

> বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি'।
> কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবই![১১]

'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুলের নন্দনতাত্ত্বিক প্রত্যয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে— "আর্ট-এর অর্থ সত্যের প্রকাশ (execution of truth), এবং সত্যমাত্রেই সুন্দর, সত্য চিরমঙ্গলময়।"[১২] স্পষ্টতই, তাঁর নন্দনচেতনায় সত্য-সুন্দর-মঙ্গল একাত্ম। 'রাজবন্দির জবানবন্দি' নামাঙ্কিত বিখ্যাত প্রবন্ধটির শুরুতেই নজরুল 'বিশ্বমানবের সত্য'-এর কথা বলছেন। বলছেন— "সত্য স্বয়ং প্রকাশ।"[১৩] এখানে তিনি সত্যের চিরকালীনতার উপর জোর দিয়েছেন। নজরুল কবিকে সত্যদ্রষ্টা বলে মনে করতেন। 'রাজবন্দির জবানবন্দি'-তে তিনি বলছেন— "আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা"।[১৪] সৃজনকালে কোনো মহত্তর শক্তির দ্বারা তিনি চালিত হন, অর্থাৎ কবিতাসৃজনের ক্ষেত্রে নজরুল দৈবপ্রেরণায় বিশ্বাসী। 'রাজবন্দির জবানবন্দি'-তে তিনি বলছেন— "আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী।"[১৫] আবার 'আমার লিগ কংগ্রেস' নিবন্ধেও তাঁর অনুরূপ উচ্চারণ— "আমার কবিতা আমার শক্তি নয়; আল্লার দেওয়া শক্তি— আমি উপলক্ষ মাত্র! বীণার বেণুতে সুর বাজে কিন্তু বাজান যে-গুণী, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।"[১৬] নজরুলের নন্দনভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে সুন্দর। এ বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'আমার সুন্দর'। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও আইডেন্টিটিকে অবলম্বন করে কবি যে বহুবিচিত্র সুন্দরকে অনুভব করেন, সেকথাই ভাষারূপ পেয়েছে এই লেখাটিতে। সাহিত্যজীবনের উপান্তে তিনি খুঁজে পাচ্ছেন পরম সুন্দরকে। 'প্রত্যভিভাষণ'-এ কিটসের "Beauty is truth, truth beauty" এই বাণীর প্রসঙ্গ কবি

স্মরণ করেন এবং এর সঙ্গে নিজের নন্দনভাবনার একাত্মতা অনুভব করেন।[১৭] সুন্দরের সূত্র ধরেই নজরুলের কবিচেতনায় আসে বেদনার প্রসঙ্গ। ২৪-২-২৮ তারিখে কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা চিঠিতে নজরুল বলেন— "আর মনে হচ্ছে, ছোট্ট দুটি কথা—'সুন্দর' ও 'বেদনা'। এই দুটি কথাতেই আমি সমস্ত বিশ্বকে উপলব্ধি করতে পারি।"[১৮] অন্যদিকে 'আনন্দ'-কেই রবীন্দ্রনাথের নন্দনভাবনার চাবিশব্দ বলা যেতে পারে, সৌন্দর্য সেখানে মুখ্য নয়। নজরুলের নন্দনভাবনা সত্য-সুন্দর-মঙ্গলকে ভিত্তি করে রচিত হলেও তার কেন্দ্রে রয়েছে সুন্দর। বাহ্য জগত থেকে অতীন্দ্রিয় জগত সবকিছুকেই নজরুল সুন্দরের নিরিখে দেখতে চেয়েছেন। 'প্রত্যভিভাষণ'-এ কবির আবেগময় উচ্চারণ— "আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তার চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব-স্তুতি।"[১৯] এখানে কবির উচ্চারণে দেবী সরস্বতীর বীণার সুরের সঙ্গে পরাধীন দেশমাতৃকার বেদনা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে! 'মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা' শীর্ষক নিবন্ধে কবির মন্তব্য— "সুর আমার সুন্দরের জন্য, আর তরবারি সুন্দরের অবমাননা করে যে— সেই অসুরের জন্য।"[২০] জীবন ও জগতের যা কিছু অভিজ্ঞতা, যা কবিমনকে আবেগতাড়িত করে, ভাবাক্রান্ত করে ও নিবিড় অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, তা-ই কবির কাছে শেষপর্যন্ত সুন্দর হয়ে ধরা দেয়। এই সুন্দরকে অবলম্বন করেই নজরুলের সমগ্র কবিজীবনের নন্দনভাবনাকে পাঠ করা সম্ভব।

'ধূমকেতু'র পথ' নিবন্ধে নজরুল চাঁছাছোলা ভাষায় পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করছেন এবং প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করার কুবুদ্ধিকে বর্জন করতে আহ্বান করছেন। বরং সেখানে তিনি বলছেন— "পূর্ণস্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে।"[২১] 'আমি সৈনিক' নিবন্ধে বিদ্রোহের প্রসঙ্গ পুনরুচ্চারিত হচ্ছে—

> দেশকে যে নারীর করুণা দিয়ে সেবা করে সে পুরুষ নয়, হয়তো সে মহাপুরুষ। কিন্তু দেশ এখন চায় মহাপুরুষ নয়, দেশ চায় সেই পুরুষ যার ভালোবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে। যে দেশকে ভালোবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না, সে দরকার হলে আঘাতও করবে, প্রতিঘাতও বুক পেতে নেবে, বিদ্রোহ করবে।[২২]

শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে নজরুল এক 'সেনাপতি', 'মহাসেনানী', 'অপ্রকাশ মহাবিদ্রোহী', 'অনাগত মহাবিদ্রোহী বিপুল শক্তি'-কে আহ্বান করছেন—যার নাতিস্পষ্ট অবয়বের মধ্যে আবার প্রলয়ের দেবতার রুদ্রজ্বালাও মিলেমিশে থাকে। আয়ারল্যান্ড, তুরস্কের পাশাপাশি রাশিয়ার জাগরণে প্রাণিত হয়ে কবি স্বদেশেও নবযুগের আবাহন করেছেন। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কৃষক-মজুর তথা জনশক্তির জাগরণ চেয়েছেন। কাব্যকবিতায় তারুণ্য ও যৌবনের জয়গান গেয়েছেন। তিনি শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক শাসকের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেননি, নিজের সমাজ-জাতি-দেশের যাবতীয় জরা-মিথ্যা-ও-মৃতের বিরুদ্ধে অভিযান ঘোষণা করেছেন। আঘাত দিয়ে ভাঙতে চেয়েছেন নতুন করে গড়ার আশাতে। বিদ্রোহ ও প্রেম নিয়ে নজরুলের মধ্যে এক অদ্ভুত টানাপোড়েন চোখে পড়ে। বহুখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাতেই আছে— "মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য।"[২৩] সেখানে আরও আছে—

> আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
> আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম-উদ্দাম, আমি ধন্যি!—[২৪]

নজরুলের এই প্রেম ও বিদ্রোহকে কখনো কখনো সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু তারা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সাহিত্যজীবনের উপান্তে এসে নজরুল নিত্য পরমানন্দময়ী পরম প্রেমময়ী পরমা শ্রীকে নিজের অস্তিত্ব নিজের শক্তিরূপে খুঁজে পাচ্ছেন। 'মধুরম' নামাঙ্কিত নিবন্ধে নজরুল এ সম্পর্কে বলছেন—

> এই প্রেমই যেন আমার অস্তিত্ব। এই অস্তিত্ব, এই প্রেমকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলেই যেন আমি অভিমানে সংহারের পথে চলেছিলাম। এই পরম-নিত্য প্রেম-শক্তিকে পেয়েই আমি পরম নিত্যম আমার eternal existence-কে পেলাম।[২৫]

নিচু তলার মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও নিজের শ্রেণিগত অবস্থান ভেঙে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যক্ষরূপে তাদের একজন হয়ে উঠতে পারেননি, দূরত্ব থেকেই গেছে। *আরোগ্য*-এর ১০নং কবিতায় 'ওরা' সর্বনামের ব্যবহার লক্ষ করার মতো—

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল,
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।[২৬]

অন্যদিকে নজরুল ছিলেন দরিদ্র জনসমাজের প্রতিনিধি। তাঁর কাব্যের নাম *সর্বহারা,* সম্পাদিত পত্রিকার নাম *লাঙল,* 'কৃষক মজুর স্বরাজ পার্টি'-র তিনি ইশতেহার-রচয়িতা। 'কৃষাণের গান'-এর পাশাপাশি তিনি লিখেছেন 'শ্রমিকের গান'। শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে 'ধর্মঘট' নিয়ে প্রবন্ধ পর্যন্ত লিখেছেন। এ থেকেই স্পষ্ট হয় যে, নজরুল তাঁর কবিতায় কাদের কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন, তাঁর পক্ষপাতিত্ব কাদের প্রতি। 'কৃষাণের গান'-এ নজরুলের উচ্চারণ—

মোদের উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ
ওই বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ,
ও ভাই লক্ষ হাতে টানছে তারা লক্ষ্মী মায়ের কেশ,
আজ মা-র কাঁদনে লোনা হল সাত সাগরের জল।।[২৭]

এখানে কৃষাণকে কবি 'ভাই' বলে সম্বোধন করছেন এবং তাদের সঙ্গে কবির অস্তিত্ব মিলেমিশে গিয়ে সর্বনাম হয়ে উঠছে 'মোরা'। নজরুল তাদেরই একজন, কৃষাণের জীবনের শরিক হয়ে ওঠার জন্য তাঁকে আলাদা প্রযত্ন নিতে হয়নি। আর এভাবে তাঁর হয়ে ওঠার মধ্য দিয়েই নজরুল সহজে রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন।

নজরুল তরুণ বয়সে রুশ বিপ্লবের দ্বারা যেমন গভীরভাবে আলোড়িত হন, তেমনি কার্ল মার্কস্ তাঁর কাছে হয়ে ওঠেন 'ঋষি'। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মুজফফর আহমদের সঙ্গে একত্রবাস নজরুলকে মার্কসবাদী দর্শনের প্রতি আরও আকৃষ্ট করে তোলে। *লাঙল* পত্রিকার ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়: উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলি', শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের এই গঠনতন্ত্র স্বয়ং নজরুল রচনা করেছিলেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য ছিল। বোমা এবং পিস্তলের শক্তি অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী গণ-আন্দোলনের চলমান শক্তি প্রয়োগেই নিরস্ত্র জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় বলে নজরুল মনে করছেন। তাতে নিরস্ত্র প্রাণহীনের দেশে বিপ্লবের বন্যা আসবে, যুগান্তরের সঞ্চিত জঞ্জাল ভেসে যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করেছেন। ঐ ডিসেম্বর ১৯২৫ ও এপ্রিল ১৯২৬-এই প্রকাশিত হচ্ছে যথাক্রমে *সাম্যবাদী* ও *সর্বহারা* কাব্যগ্রন্থ দুটি। 'সাম্যবাদী' কবিতার 'মানুষ' উপশিরোনামানঙ্কিত অংশের শুরুতেই কবির উচ্চারণ—

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্![২৮]

এই উচ্চারণ ও তাঁর *সাম্যবাদী* কাব্যগ্রন্থের পাঠ থেকে স্পষ্ট হয় যে, নজরুলের সাম্যবাদে মার্কসের অনুপুঙ্খ অনুসরণ নেই। তাঁর সাম্যবাদী ভাবনায় চণ্ডীদাস-লালন-মধুসূদন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ এসে মিলেমিশে গেছে, মহত্তর মানবতার পাঠ তাঁকে ভাবিয়েছে। 'উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব ও নজরুলসাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষের গুরুত্বপূর্ণ অভিমত— "বস্তুত, সাম্যবাদী চিন্তা তাঁর মানসলোকে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মানবসত্তার জন্ম দিয়েছে— হিন্দু ও মুসলমান বৈপরীত্যের দ্যোতক না হয়ে তাঁর চেতনায় হতে পেরেছে জাতিসত্তার পরিপূরক দুই শক্তি।"[২৯] ঐ সাম্যবাদী ভাবনার নিরিখেই তাঁর স্বদেশচেতনার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবোধের কোনো বিরোধ ঘটেনি। ১৯২৬-২৭ নাগাদ নজরুল ইন্টারন্যাশনাল সংগীতের তরজমা করেন 'অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত' শিরোনামে। গানটির ভিতর দিয়ে সারা দুনিয়ার সর্বহারা শ্রেণির আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধতা প্রকাশ পায়। ১৯৩৮-এ কবি 'জন-সাহিত্য' শীর্ষক একটি ভাষণ দেন, সেখানে তিনি বলেন—

> জন-সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য রসের পরিবেশন করা। আজকাল সাম্প্রদায়িক ব্যাপারটা জনগণের একটা মস্ত বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে; এর সমাধানও জন-সাহিত্যের একটা দিক।[৩০]

জন-সাহিত্যের জন্য জনগণের সঙ্গে সংযোগ প্রয়োজন। এই সাহিত্যে তাদের মতো করেই তাদের কথা বলতে হবে বলে নজরুল মনে করেছেন।

নজরুল চারণের মতো দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে পরিক্রমণ করেছেন তারুণ্যকে জাগিয়ে তুলতে। তিনি আঘাত হেনে বাঙালির কর্মশক্তিকে জাগাতে চেয়েছেন। মুসলিম জনসমাজকে সংঘবদ্ধ করার জন্য এবং তাদের জড়ত্ব-আলস্য-কর্মবিমুখতা-অন্ধতা দূর করার জন্য কবি আজীবন চেষ্টা করেছেন। ইব্রাহিম খানকে লেখা চিঠিতে তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ—

> আমি জানি যে, বাংলার মুসলমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড়ো কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এদের আত্ম-জাগরণ হয়নি বলেই ভারতের স্বাধীনতার পথ আজ রুদ্ধ।
>
> হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, আমিও মানি। এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে।[৩১]

অন্যদিকে প্রথম থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় সভ্যরা ছিলেন মুখ্যত অভিজাত সমাজের। খেটে খাওয়া নিচুতলার মানুষের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নিবিড় হয়ে ওঠেনি। এই দিকটিও নজরুলের দৃষ্টি এড়ায়নি, তাঁকে পীড়িত করেছে। কবিতায় তিনি লিখবেন—

> ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন!
> বেলা ব'য়ে যায়, খায়নি ক বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন![৩২]

উপরের লাইনগুলো যেন নিছক কবিতা নয়, হয়ে উঠেছে নিপীড়িত মানুষের অধিকার ফিরে পাওয়ার প্রতিবাদী স্লোগান। মানুষের অস্তিত্বের মৌল দাবিকে কবি একেবারে মুখের অনাবরণ ভাষায় তুলে ধরেছেন বলেই এমন আগুন ঝরানো পঙ্‌ক্তিগুলো সমাজমানসে গেঁথে যায় এবং সবকালের সমসাময়িক হয়ে ওঠে। নজরুলের বেশ কিছু কবিতায় এমন স্লোগানধর্মিতা চোখে পড়বে, এদিক থেকে তিনি সুকান্ত ভট্টাচার্য বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বসূরী।

'মন্দির ও মসজিদ' নিবন্ধে নজরুল পুরোহিত মোল্লাদেরকে 'ধর্ম-মাতাল' রূপে চিহ্নিত করেন— "ইহারা ধর্ম-মাতাল। ইহারা সত্যের আলো পান করে নাই, শাস্ত্রের অ্যালকোহল পান করিয়াছে।"[৩৩] ভারতীয় উপমহাদেশে আবহমান কাল ধরে ধর্ম জীবনযাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হয়ে থেকেছে। নজরুলের পিতা ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান, একইসঙ্গে অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। শৈশবে নজরুল গ্রামের মক্তবে লেখাপড়া শুরু করেন এবং নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গ্রামের সেই মক্তবেই শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। এরপর তিনি হাজি পালোয়ানের মাজার শরিফের খাদেমগিরি ও পিরপুকুর মসজিদের ইমামতির কাজ করেন। উদার ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠার কারণে নজরুল যেমন নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছেন, তেমনি অন্য ধর্মকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে শিখেছেন—সংকীর্ণ ধর্মীয় পরিচয়ে আবদ্ধ থাকেননি। 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে নজরুলের আরও গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ— "ধর্মের সত্যকে সওয়া যায়, কিন্তু শাস্ত্র যুগে যুগে অসহনীয় হয়ে উঠেছে বলেই তার বিরুদ্ধে যুগে যুগে মানুষও বিদ্রোহ করেছে।"[৩৪] কার্ল মার্কস্ ধর্মকে যেখানে 'opium of the people'[৩৫] রূপে চিহ্নিত করে তাকে নাকচ করে দেন, সেখানে নজরুল মার্কসবাদে প্রাণিত হয়েও ধর্মের সত্যকে অস্বীকার করতে পারেন না। কবিজীবনের উপান্তে (১৯৪০) এসে 'স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ' নিবন্ধে ইসলামের মধ্যেই তিনি সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের বীজ খুঁজে পান—

> আজ জগতের রাজনীতির বিপ্লবী আন্দোলনগুলির যদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায় তবে বেশ বুঝা যায় যে, সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে। আমার ক্ষুধার অন্নে তোমার অধিকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার উদ্বৃত্ত অর্থে তোমার নিশ্চয়ই দাবি আছে—এ শিক্ষাই ইসলামের।[৩৬]

কবির এমনতর পর্যবেক্ষণের সঙ্গে অনেকে সহমত নাই হতে পারেন, কিন্তু এর থেকে কবির বিশ্বাস ও মনোভঙ্গির বিশিষ্টতাকে চিনে নেওয়া সম্ভব।

নজরুলের বিদ্রোহ ছিল একসঙ্গে সামন্ততন্ত্র-পুঁজিবাদ-উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। ঔপনিবেশিকতা নিজের স্বার্থেই সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহ দেয়। নজরুল সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাই মানবমুক্তির সংগ্রামকে তিনি ইতিহাসের বৃহৎ প্রেক্ষাপট থেকে দেখেছেন। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর স্বর এতটাই স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, এক বছরের জন্য তাঁকে কারারুদ্ধ থাকতে হয়। তাঁর ছয়টি গ্রন্থকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন উদাহরণ আর দ্বিতীয়টি নেই। বি-উপনিবেশায়নের প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। জাতীয় কংগ্রেস যখন ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস পেলেই খুশি, নজরুল তখন *ধূমকেতু*-তে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানাচ্ছেন। প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হলেও উপনিবেশের মানুষের মনোজগতে উপনিবেশবাদ জারি থাকে। নজরুল তাঁর লেখায় 'মনের গোলামী' থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান। দেশবাসীকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার কথা বলেন। উপনিবেশবাদ চায় উপনিবেশিত মানুষের নিজস্ব ইতিহাস সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দিতে, আধিপত্যের মাধ্যমে তার জ্ঞানভাষ্যকে কোণঠাসা করতে কিংবা নিজের করে নিতে, যাতে দেশীয় জ্ঞানের চেহারা ও চরিত্র হারিয়ে যেতে থাকে। মনে পড়বে, নজরুল সাহিত্যের সর্বজনীন হয়ে ওঠার পাশাপাশি বলেছিলেন নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে তার মধ্যে রক্ষা করার জন্য। এভাবেই উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে নজরুলের কণ্ঠস্বর অক্লান্তভাবে ধ্বনিত হতে থাকে— "আমি সেই দিন হব শান্ত/ যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,/ অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না"।[৩৭]

১৯২৪ সালে জেল থেকে মুক্তিলাভের পরই কাজী নজরুল ইসলামকে দেখার ও তাঁর কণ্ঠে গান ও ভাষণ শোনার জন্য দেশের চারদিক থেকে কবির কাছে আমন্ত্রণ আসতে থাকে। কবিও সাগ্রহে সানন্দে এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে নানা সভাসমাবেশে অংশগ্রহণ করেছেন, যথাসম্ভব বক্তৃতা দিয়েছেন, গান গেয়েছেন, স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেছেন। বাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমণ করেছেন, মিশে গেছেন সাধারণ মানুষের ভিড়ে। যুক্ত থেকেছেন বিভিন্ন গণ-আন্দোলন ও গণসংগঠনের সঙ্গে। এমন নিবিড় জনসংযোগ তাঁর কবিতারচনার ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য একটি কাব্যগ্রন্থের নামই যথেষ্ট। অক্টোবর ১৯২৬-এ প্রকাশিত *সর্বহারা*, কাব্যগ্রন্থটির অন্তর্গত 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান', 'ধীবরদের গান' ও 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' প্রতিটি গান রচনার স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিত ছিল। ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ কৃষ্ণনগর টাউনহলে 'বেঙ্গল পেজ্যান্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি'-র অধিবেশনে কবি স্বরচিত 'কৃষাণের গান' সকণ্ঠে পরিবেশন করেন। 'শ্রমিকের গান'-ও একই সময়ে রচিত ও গীত হয়। এই বছরেরই ১১-১২ মার্চ ফরিদপুরের মাদারিপুরে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গ আসাম মৎস্যজীবী সম্মেলন' উপলক্ষে রচিত ও গীত হয়েছিল 'ধীবরদের গান'। ১৯২৬-এর এপ্রিল থেকে দেশে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৬-এর ২২ মে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সম্মেলনে নজরুল পরিবেশন করেছিলেন তাঁর সদ্যরচিত 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গানটি। এই একই সভায়োজনে ছাত্র-যুব সম্মেলনের জন্য তিনি রচনা করেছিলেন 'ছাত্রদলের গান'। তাঁর উদ্দীপনী কবিতা ও কণ্ঠের গান সকলকে উজ্জীবিত করে তোলে। কবির *বিষের বাঁশি* বা *ভাঙার গান* নিষিদ্ধ হলেও গোপনে বিপ্লবীদের হাতে হাতে ঘুরতো। সমকালেই কবি বিপুল পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেন। বাঙালি পাঠকের রুচিনির্মাণে তাঁর কাব্যকবিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক বিষয়ের উপস্থাপনা এবং আবেগের অতিপ্রাধান্য তাঁর কাব্যকবিতায় শৈথিল্য এনে দিয়েছে।

নজরুলের পঁচিশ বছর বয়স থেকে তাঁর কাব্যগ্রন্থে গানও স্থান পেতে শুরু করে। ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয় *দোলনচাঁপা*, *বিষের বাঁশি*, *ভাঙার গান*, *ছায়ানট*, *পূবের হাওয়া*, *ফণিমনসা*। ১৯২৮-এ প্রকাশিত হচ্ছে গানের স্বতন্ত্র বই *বুলবুল*, পরের বছর *চোখের চাতক*। স্পষ্টতই কবি নজরুলকে গীতিকার নজরুলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না, এই দুই সত্তা নিবিড়ভাবে ওতপ্রোত। এক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের সার্থক উত্তরসূরী। 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে নবীন সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে নজরুলের পরামর্শও লক্ষ করার মতো—

> নবীন সাহিত্যিকগণ সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকিবার জন্য যদি এক-আধটু করিয়া সংগীতের আলোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিবেন তাঁহাদের লেখার মধ্যে এই সংগীত, সুরের এই ঝংকার উন্মুক্ত প্রফুল্লচিত্তের এই মোহন-বিকাশ ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাদের লেখার মধ্যে এক নূতন মাদকতা, অভিনব শক্তি দান করিতেছে।[৩৮]

নজরুলের সংগীতভাণ্ডারে আছে গণসংগীত, দেশাত্মবোধক গান, প্রেমের গান, প্রকৃতিবিষয়ক গান, ভক্তিগীতি, হাসির গান আরও বিচিত্র বিষয়ের গান। ১৯২৯-এ নজরুল এইচএমভি কোম্পানিতে গীতিকার-সুরকার-প্রশিক্ষক রূপে যোগদান করেন। ১৯৩২-এ যোগদান করেন স্বদেশী গ্রামোফোন কোম্পানিতে। আর ১৯৩৫-এ গ্রামোফোন কোম্পানিতে পূর্ণ সময়ের গীতিকার, সুরকার ও প্রশিক্ষকরূপে নিয়োজিত হন। আর্থিক অসহায়তায় বাজারের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে কবি নজরুল স্বেচ্ছা-নির্বাসনে গেলেন। এ প্রসঙ্গে 'অঞ্জলি লহ মোর সংগীতে' শীর্ষক প্রবন্ধে অরুণকুমার বসু স্বয়ং নজরুলের উদ্দেশ্যেই এক তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেন— "পণ্যব্যাপারীদের লোভের খাতে অঙ্কবৃদ্ধি ঘটাতে গিয়ে আপনার বিদ্রোহী-বিপ্লবী-সমাজসচেতন-গণমুখী কবিচেতনার সঙ্গে কি চিরবিচ্ছেদ ঘটাননি?"[৩৯] এই সময়পর্বে কবির ব্যক্তিজীবনেও মর্মান্তিক আঘাত নেমে আসে। ১৯৩০-এ পুত্র বুলবুলের মৃত্যু হয়, ১৯৩৮-এ কবিপত্নী প্রমীলা দেবী আক্রান্ত হন পক্ষাঘাত রোগে। এ সময় কবি ক্রমে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন।

নজরুলের কাব্যকবিতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ব্যঙ্গ-ও-কৌতুক প্রবণতা। যেখানে কোনো সিরিয়াস বিষয় সহজে সরাসরি উপস্থাপনার অবকাশ নেই, সেসব ক্ষেত্রে সাহিত্যিকরা ব্যঙ্গ কৌতুককে অবলম্বন করেন। আবুল মনসুর আহমদ প্রণীত গল্পগ্রন্থ *আয়না*-কে নিয়ে লেখা গ্রন্থসমালোচনা 'আয়নার ফ্রেম'-এ নজরুল নিজস্ব ভঙ্গিতে ব্যঙ্গের অনন্যতার কথা উল্লেখ করেছেন—

> বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ-সাহিত্য খুব উন্নত হয়নি, তার কারণ, ব্যঙ্গ সৃষ্টিতে অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন। এ যেন সেতারের কান মলে সুর বের করা—সুরও বেরুবে, তারও ছিঁড়বে না।[৪০]

নজরুলের কাব্যকবিতায় ব্যঙ্গের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে *চন্দ্রবিন্দু* কাব্যগ্রন্থের 'প্যাক্ট্', 'শ্রীচরণভরসা', 'দে গরুর গা ধুইয়ে' কবিতাগুলিকে। হাসির পিছনে যে অশ্রু আছে, দংশনের পিছনে যে দরদ আছে, তা যাঁরা ধরতে পারবেন, ব্যঙ্গের প্রকৃত রসোপলব্ধি তাঁরাই করতে পারবেন বলে নজরুল পূর্বোক্ত সমালোচনায় জানিয়েছেন।

নজরুলের কবিতায় আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দের বহুল ব্যবহার আছে। নজরুলের কাব্যকবিতার এই বিশেষত্ব তাঁকে প্রথম থেকেই বাঙালি পাঠকের কাছে বিশিষ্ট করে তুলেছে। অনেক কবিতায় কবি অপরিচিত আরবি ফারসি শব্দের অর্থ পাদটীকায় যোগ করে দিয়েছেন। তবে কবির বহু আগে ভারতচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ যে কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ করে গেছেন, সে সম্পর্কেও নজরুল সচেতন ছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'বড়োর পিরিতি বালির বাঁধ' শীর্ষক নিবন্ধে কবির গুরুত্বপূর্ণ অভিমত—

> ওই একটু ভালো শোনাবার লোভেই, ওই একটি ভিনদেশি কথার প্রয়োগে অপূর্ব রূপ ও গতি দেওয়ার আনন্দেই আমিও আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করি। ...কবিগুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান যে, বাংলার কাব্যলক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তারা তাঁদের কাছ থেকে টুপি আর চাপকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারেঙ্গির সুর শুনতে, ফুলবনের কোকিলের গানের বিরতিতে বাগিচায় বুলবুলির সুর।[৪১]

ভিন্ন ভাষার শব্দ প্রয়োগে জ্বলে উঠতে পারে নতুনতর কাব্যিক আলো। কিন্তু সচেতন থাকা প্রয়োজন, ভিন্ন ভাষার শব্দের অনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক চলনই যেন ব্যাহত না হয়! এক্ষেত্রে ইব্রাহিম খানকে লেখা চিঠিতে নজরুলের আরও এক জবাবদিহি আছে—

> বাংলা-সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায় হিন্দুরও তেমনই মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে নিত্য-প্রচলিত মুসলমানি শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ-সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্যে অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্য হানি হয়েছে। তবু আমি জেনে-শুনেই তা করেছি।[৪২]

এবারে আসা যাক আধুনিকতা প্রসঙ্গে নজরুলের ভাবনায়।

তিনের দশকের কবিরা কবিতায় নতুন যুগ তৈরি করার স্বপ্নে এতটাই বিভোর ছিলেন যে, কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকাংশই ইউরোপ-কেন্দ্রিকতায় আচ্ছন্ন ছিলেন। ফলত নিজের দেশ-কাল-সংস্কৃতিকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বোদলেয়ার-পাউন্ড-এলিয়টের নান্দনিক জ্ঞানভাষ্যকে কবিতায় উপস্থাপন করার প্রবণতা চোখে পড়লো। এই ইংরেজি জানা, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সমাজের কবিকুলের কাছে নজরুল ছিলেন অপর। তাই বাংলা কবিতায় আধুনিকতাবাদের প্রতিষ্ঠায় যিনি ছিলেন অগ্রণী, সেই বুদ্ধদেব বসু *কালের পুতুল* গ্রন্থের অন্তর্গত 'নজরুল ইসলাম' শীর্ষক সমালোচনায় নজরুলকে প্রকৃত প্রস্তাবে চিনে উঠতে পারেননি।[৪৩] 'আবারও বুদ্ধদেব বসু: কিছু প্রসঙ্গ, কিছু প্রশ্ন' প্রবন্ধে আজফার হোসেন পরতে পরতে বিশ্লেষণ করে দেখান, 'বুদ্ধদেব-প্রভাবিত সাহিত্যিক আধুনিকতাবাদ বিভিন্নভাবেই এক ধরনের নান্দনিক উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া চালু রাখল।'[৪৪] প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতাকে নজরুল কোনো সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখেননি। যে ওমর খৈয়াম-কে তিনি অনুবাদ করেছেন, সেই ওমর তাঁর রুবাইয়াতে জিজ্ঞাসা করতে শিখিয়েছেন, তুলে ধরেছেন চিরন্তন প্রশ্নকে। এমন প্রশ্নমালাকে ঘিরে তাঁর রুবাইয়াতে শোনা যায় তরঙ্গ-সংঘাতের সংগীত-বিলাপ-ও-গর্জন। এমন দৃপ্ত ভঙ্গিমা চূর্ণ করে দিয়ে যায় ভণ্ডামি, মিথ্যা বিশ্বাস, সংস্কার, বিধি-নিষেধের বেড়াজালকে। এ কারণেই 'ওমরের কাব্যদর্শন' নিবন্ধে তাঁর প্রতি নজরুলের সপ্রশংস মন্তব্য— "আজকাল পৃথিবীর কোনো মডার্ন কবিই তাঁর মতো মডার্ন নন, তরুণও নন। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-প্রবুদ্ধ লোকও তাঁর সব মত বুঝি হজম করতে পারেন না।"[৪৫] নজরুলের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই স্পষ্ট হয় যে, মডার্নিটিকে তিনি কালের কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে বাঁধতে চাননি। তাঁর মধ্যে ছিল এক বহুভাষিক সত্তা, ভারতীয় উপমহাদেশের আবহমান কাব্যচর্চা এবং সংগীতের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে যাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল। ধর্ম সংস্কৃতির সূত্র ধরেই মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিও তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। তাঁর কাব্যকবিতায় ভারতীয় পৌরাণিক উপাদানের পাশাপাশি ইসলামী মিথের বহুল প্রয়োগ চোখে পড়ে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে শুধুমাত্র আধুনিক বাংলা কবিতার প্রস্তুতিপর্বের কবিরূপে না দেখে উচিত তাঁর মধ্য দিয়ে কীভাবে বিকল্প আধুনিকতাকে সন্ধান করা যায়। ইব্রাহিম খানকে লেখা চিঠিতে নিপীড়িত, দুঃখী, হতভাগা মানুষের বেদনাকে আধার করেই নবীন সাহিত্য-স্রষ্টারা কাব্যকবিতার নতুন ধারা গড়ে তুলবেন বলে নজরুল আশা করেছেন। পরবর্তীকালের বাংলা কাব্যকবিতার একটি মুখ্যধারা কবি-নির্দেশিত ঐ পথে প্রবাহিত হয়েছে।

দৈবপ্রেরণা, সুন্দরের অনুধ্যান, আবেগের প্রাধান্য, প্রেম ও বেদনা নজরুলের নন্দনভাবনাকে অনেক ক্ষেত্রে রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের কাছাকাছি এনে দাঁড় করালেও তাঁকে পুরোপুরি এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। রোমান্টিক দ্রোহের সঙ্গে নজরুলের বিদ্রোহের মূলগত পার্থক্য রয়েছে। ফরাসি বিপ্লব রোমান্টিক দ্রোহের একটি প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল। সেই রোমান্টিক দ্রোহের পিছনে এক বিপ্লবী চেতনা সক্রিয় থাকলেও তা ছিল মুখ্যত ভাবগত ও আদর্শগত। সেখানে নজরুলের বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শাসন ও সামাজিক অচলতায়নের বিরুদ্ধে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ এবং রাজনীতি-সচেতন। তাঁর বিদ্রোহ নিছক কল্পনার ফসল নয়, বরং মাটি-সংলগ্ন মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তারই ভিতর থেকে উঠে আসা। বাঙালি পাঠক নিজেদের সুবিধা মতো কবি নজরুলকে সংক্ষিপ্ত ও সুলভ করে নিয়েছেন *সঞ্চিতা*-র মধ্য দিয়ে। কিন্তু এমন একটি ছোটো সংকলন হাতে নিয়ে নজরুলের বহুধা বিস্তৃত কাব্যকবিতার কাছে আদৌ পৌঁছানো সম্ভব নয়। নব্য ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হলে, সমস্ত রকম সামাজিক বৈষম্য-অনাচার-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হতে হলে, ভারতীয় উপমহাদেশে জাতপাত ও ধর্মীয় অস্থিরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে নজরুল কাণ্ডারী হয়ে ওঠেন। তাই আরও নিবিড়ভাবে নজরুলের নন্দনভাবনাকে চিনে নেওয়া প্রয়োজন। তিনি তারুণ্যের কবি, যৌবনের কবি, বিদ্রোহের কবি, বিপ্লবের কবি; একইসঙ্গে প্রেমের কবি, শিশুদেরও কবি। তিনি একইসঙ্গে আত্মস্থ করেছেন লোকসংগীত থেকে ধ্রুপদী সংগীত পর্যন্ত বিভিন্ন সাংগীতিক ধারাকে; তিনি একাধারে দেশাত্মবোধক গান, প্রেমের গান, শ্যামাসংগীত, ইসলামী সংগীত ও হাসির গানের রচয়িতা। তিনি ভেবেছেন 'জন-সাহিত্য' থেকে 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' পর্যন্ত। নজরুলের নন্দনভাবনা পরবর্তীকালের বাংলা কবিতাকে যেমন এগিয়ে চলার পথ দেখিয়েছে, তেমনি তার মধ্য থেকে আবিষ্কৃত হতে পারে আরো নতুন নতুন সম্ভাবনা।

**সুত্রনির্দেশ:**


১. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৫), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৪৭৯।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর (প্রকাশক), (২০০০), *কাজী নজরুল ইসলাম: জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৭৭০।

৩. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৩), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৫৬৬।

৪. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৫), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, ষষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৪৪৫।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর (প্রকাশক), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৮৮।

৬. *তদেব*, পৃ. ৭২৫।

৭. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৫), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৪৭৭।

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর (প্রকাশক), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬২।

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর (প্রকাশক), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪৩।

১০. *তদেব*, পৃ. ৭৮৮।

১১. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৫), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ১৩৩।

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর (প্রকাশক), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪৩।

১৩. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৫), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৪৬১।

১৪. *তদেব*, পৃ. ৪৬৩।

১৫. *তদেব*, পৃ. ৪৬১।

১৬. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৪), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৫৪৫।

১৭. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৫), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৪৭৭।

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর (প্রকাশক), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৯০।

১৯. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৫), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৪৭৮।

২০. *তদেব*, পৃ. ৪৬৮।

২১. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৫), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৪৩৮।

২২. *তদেব*, পৃ. ৪২৪।

২৩. ইসলাম, কাজী নজরুল, (২০০৫), *সঞ্চিতা*, ডি.এম. লাইব্রেরি, পৃ. ৩।

২৪. *তদেব*।

২৫. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৪), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৫৬৪।

২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, (১৩৯৮), *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃ. ৪২।

২৭. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৫), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ১২০।
২৮. ইসলাম, কাজী নজরুল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭১।
২৯. দে, দীপাঞ্জন, (২০২৪), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম: একশো পঁচিশে*, গেটওয়ে পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৬৫৯।
৩০. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০২), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৫০৫।
৩১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর (প্রকাশক), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৮৯।
৩২. ইসলাম, কাজী নজরুল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯০।
৩৩. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৫), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৪৪১।
৩৪. *তদেব*, পৃ. ৪৪৫।
৩৫. O'Malley, Joseph, (1977), (Ed.). *Critique of Hegel's 'Philosophy of Right'*, Cambridge University Press, p. 131.
৩৬. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৩), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৫৬৬।
৩৭. ইসলাম, কাজী নজরুল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬।
৩৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর (প্রকাশক), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪২।
৩৯. *তদেব*, পৃ. ৫৩৩।
৪০. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৫), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৪৮৯।
৪১. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৩), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৫৪৩-৫৪৪।
৪২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর (প্রকাশক), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৮৯।
৪৩. বসু, বুদ্ধদেব, (২০১০), *কালের পুতুল*, নিউ এজ পাবলিশার্স, পৃ. ১২৪-১৩০।
৪৪. হোসেন, আজফার, (২০২২), *পাঠ: শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের রাজনীতি*, সংহতি প্রকাশন, পৃ. ২০৫।
৪৫. সেনগুপ্ত, কল্পতরু প্রমুখ, (২০০৪), (সম্পা.), *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র*, পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৫৫৩।